সংস্কারের কাজে খরচ করা হত। সে যুগে কৃষি জমি, ধান ও সোনা প্রভৃতি দানের সূত্র ধরে সেচব্যবস্থা সম্পন্ন হত। পল্লব রাজারা এবং গ্রামবাসীরা এই রকম দান করতেন। পল্লব যুগে দক্ষিণ ভারতে 'এরিপত্তি' বা পুকুর জমি নামে এক ধরনের জমির কথা জানা যায়, যা গ্রামের ব্যক্তিরা দান করতেন। এই জমি থেকে উৎপন্ন শস্য বিক্রি করে পুকুর সংরক্ষণ করা হত।

কৃষি ও সেচ ব্যবস্থা

পল্লব যুগে গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। লিপি থেকে গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত পল্লব শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে চোলরা গ্রামগুলিকে যে স্বাধীনতা দিয়েছিল, গ্রাম শাসনের ব্যাপারে গ্রামবাসীদের যে ক্ষমতা ও অধিকার স্বীকার করে নিয়েছিল তার তুলনায় পল্লবদের স্থানীয় স্বয়াত্তশাসন উন্নত ছিল না। তবে বলা যায়, চোল আমলের উন্নত গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনের গোড়াপত্তন পল্লবরাই করেছিল। পল্লবদের বেশ কিছু লিপিতে 'উর' নামে একটি প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ আছে, যেটা ছিল সম্ভবত গ্রামবাসীদের প্রাথমিক পর্যায়ের একটি মিলিত প্রতিষ্ঠান। গ্রামের শাসন পরিচালনায় 'উর' অনেক সময় দুটি গ্রাম পরিষদ 'সভা' বা 'মহাসভার' সঙ্গে সহযোগিতা করত। 'সভার' কাজকর্মের মধ্যে ছিল—উদ্যান ও পুষ্করিনী দেখাশোনা করা, মন্দির রক্ষণাবেক্ষণ, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, জলসেচ ব্যবস্থার পর্যবেক্ষণ, কৃষিজমি দেখাশোনা; জনগণনা, গ্রাম্য বিচারের কাজ সুষ্ঠুভাবে করা ইত্যাদি। গ্রাম সভার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কতকগুলি কমিটি বা কার্যকরী সমিতি গ্রাম-শাসনের গোটা ব্যাপারটা দেখাশোনা করত। পল্লবদের লিপি থেকে 'ভারিয়াম', 'আলুঙ্গানত্তর', 'অমৃতগণ' প্রভৃতি সমিতির নাম জানা যায়। গ্রামীণ 'সভা' এইসব সমিতি বা কমিটির কাজ ও দায়িত্ব নির্ধারণ করে দিত।

গ্রামীণ স্বায়ত্ত শাসন

পল্লব শিল্পকলা ঃ স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলা (Pallava Art, Architecture, Sculpture and Paintings) ঃ পল্লব রাজারা রাজ্য বিস্তার করে যেমন তাঁদের রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিচয় দেন, সেরূপ শিল্প, সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার দ্বারা তাঁদের বিদগ্ধ মনের পরিচয় রাখেন। দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ইতিহাস পল্লব আমলের মন্দিরসমূহ থেকে শুরু হয়েছে। পল্লব যুগের এই মন্দিরগুলিতে সর্বপ্রথম দ্রাবিড় শিল্পরীতির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। দ্রাবিড় মন্দিরের বৈশিষ্ট্য হল বিমানের পিরামিডের মত উচ্চতা। এর শীর্ষদেশ গম্বুজাকৃতি, শিল্পশাস্ত্রে যাকে 'স্তূপ' অথবা 'স্তূপিকা' বলা হয়। এই মন্দিরের ভিতরে থাকে একটি চতুষ্কোণ, গর্ভগৃহ। এর চারদিকে থাকে একটি বৃহত্তর চতুষ্কোণ আচ্ছাদিত বেষ্টনী, যাকে 'প্রদক্ষিণ' বলা হয়। মন্দিরের বাইরের দেওয়ালে, আয়তাকার স্তম্ভ দ্বারা কয়েকটি কুলুঙ্গী নির্মাণ করা হয়। এই মন্দিরের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল, চৈত্য-বাতায়নসহ উত্তল বেলনাকার কার্নিস এবং ওপরের তলগুলিকে ঘিরে সঙ্কীর্ণ অলিন্দ। পরবর্তীকালে এই মন্দিরগুলিতে স্তম্ভযুক্ত হলঘর, বড় গোপুরম নির্মাণ করা হয়েছিল। স্থাপত্য-ভাস্কর্যে দক্ষিণ ভারতীয় দ্রাবিড়-রীতির ক্রমবিকাশ পল্লব যুগকে স্মরণীয় করেছে।

মন্দির শিল্প

Scanned with CamScanner

সূক্ষ্ম শিল্পের কাজে ও সৌন্দর্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে পল্লবরা স্বকীয়তা দেখান। চোল শিল্পের বিরাটত্ব লক্ষ্য করে তার সৌন্দর্য ও সুষমার দিকে তাঁরা বেশি দৃষ্টি দেন। এই যুগের শিল্প ভাবনা ছিল ধর্মকেন্দ্রিক। ধর্মীয় বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করেই শিল্প বিকশিত হত। পল্লব শিল্পগুলি এজন্য দেবদেবীর মন্দির ও রথের আকারেই বিকশিত হত। পল্লব শিল্পের বৈশিষ্ট্য ছিল, গোটা একটি পাহাড়কে কেটে রথ বা মন্দিরের আকৃতিতে পরিণত করা এবং সেই মন্দিরের গায়ে ভাস্কর্যের কাজ। রোমিলা থাপার বলেছেন যে, বৌদ্ধ গুহা মন্দিরের অনুকরণে পল্লব পাহাড়-কাটা মন্দিরগুলি তৈরি হয়। তবে পল্লব মন্দিরগুলির নিজস্ব কিছু প্রকরণ ও রীতি ছিল। বিভিন্ন সময়ে এই রীতি ও ভঙ্গিমার বিবর্তন ঘটে। সুতরাং যদি আদপেই অনুকরণ করা হয়ে থাকে তা অন্ধ অনুকরণ ছিল না, একথা বলা চলে। পল্লব যুগের মন্দির যাঁরা নির্মাণ করেন শিল্পের ক্ষেত্রে তাঁরা একেবারে নবীন আগন্তুক ছিলেন না, তাঁদের শিল্প ভাবনায় বংশগত শিক্ষা ও দক্ষতা নিশ্চয়ই ছিল। তাঁদের পূর্ব-পুরুষরা দারুশিল্পে যে দক্ষতা দেখান, পল্লব শিল্পীরা পাথর খোদাইয়ের কাজে সেই দক্ষতা দেখান। পল্লব মন্দিরগুলি দু'ধরনের ছিল, যথা—পাহাড় খোদাই করে মন্দির ও স্বাধীন, স্বতন্ত্র মন্দির। বলা যায়, পল্লব যুগে উভয়ের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল। পল্লব শিল্পীরা ধীরে ধীরে দারুশিল্প ও গুহাস্থাপত্যের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করেছিলেন।

মন্দির শিল্পের বৈশিষ্ট্য

মহেন্দ্র বর্মনের আমলের মন্দিরগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। (১) সাধারণ স্তম্ভ ও মণ্ডপ-যুক্ত মন্দির, (২) বৌদ্ধ বিহারের অনুকরণে পাহাড় কেটে গুহা মন্দির। শেষের রীতি অনন্ত শায়ন ও ভৈরব কোন্ড মন্দিরের ক্ষেত্রে দেখা যায়। স্তম্ভযুক্ত মণ্ডপের উচ্চতা ৫০ ফুট; স্তম্ভগুলির ভাস্কর্য অসাধারণ এবং সিংহের আকারে খোদাই। এছাড়া একাম্বরনাথ মন্দিরের নির্মাণেও মহেন্দ্র রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। মহেন্দ্র রীতির বৈশিষ্ট্য ছিল, পাহাড়ের ভিতরটি পুরা কেটে তার ভেতরে গুহা মন্দির তৈরি করা। পাহাড়ের ছাদ ধরে রাখার জন্য ত্রিকোণ থাম অথবা গোলাকার থাম। (৩) মহামল্ল রীতি নরসিংহবর্মনের আমলে চালু হয়। এই রীতিকে একশিলা বা রথশৈলীও বলা হয়। মাদ্রাজের ত্রিশ মাইল দক্ষিণে মহাবলীপুরমের পাঁচটি রথ এই রীতির পরিচয় দেয়। পুরা গ্রানাইট পাথরের পাহাড় কেটে সমুদ্রতীরে রথের আকৃতির মন্দির তৈরি করা হয়। গুহা মন্দির বা মণ্ডপগুলি পাহাড় খোদাই করে তৈরি করা হয়। মহাবলীপুরমে মোট ৮টি রথ আছে। সাধারণত এই রথগুলিকে 'সাত প্যাগোডা' নাম দেওয়া হয়। এই রথগুলির ৫টি রথ পঞ্চ পাণ্ডবের নামে ও একটি দ্রৌপদীর নামে, একটি গণেশের নামে। সব কটি রথ বা মন্দির হল শিব মন্দির। সহদেব, ভীম ও ধর্মরাজ রথের চূড়া পিরামিডের মত ধাপে ধাপে কোণা হয়ে গেছে এবং জানালাগুলি বৌদ্ধ চৈত্যের জানালার আদলে খোদাই করা। অর্জুন রথটিতে দ্রাবিড় শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। রথগুলি গড়ে লম্বায় ৪২ ফুট, চওড়ায় ৩৫ ফুট, উচ্চতায় ৪০ ফুট। সমালোচকদের মতে, এই রথগুলির নির্মাণ দ্বারা পল্লব স্থাপত্যের একটি

পল্লব স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের বিভিন্ন শৈলী

যুগের অবসান সূচিত হয়। রথগুলির ভেতর দিক অসম্পূর্ণ হলেও বাইরে অসাধারণ সূক্ষ্ম ভাস্কর্যের কাজ দেখা যায়। এছাড়া মহামল্ল রীতি অনুসারে পাহাড় খোদাই করে গুহা মন্দির নির্মাণ করা হয়। এই গুহা মন্দিরগুলির মধ্যে ত্রিমূর্তি, বরাহ, দুর্গা প্রভৃতির গুহা মন্দির প্রশস্ত এবং উঁচু। (৪) মহামল্ল যুগের পরে পল্লব স্থাপত্যে নতুন রীতির সৃষ্টি হয়। এই অধ্যায়ের মন্দিরগুলিকে দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। প্রথম শ্রেণির মন্দির নির্মাণ আরম্ভ রাজসিংহ গোষ্ঠীর রাজত্বকালে (৭০০-৮০০ খ্রিস্টাব্দ) নির্মিত হয়েছিল। দ্বিতীয় শ্রেণির মন্দিরগুলির নির্মাণকাল নন্দীবর্মন গোষ্ঠীর রাজত্বকাল (৮০০-৯০০ খ্রিস্টাব্দ)। এই রীতিতে রাজসিংহ রীতির মন্দিরও তৈরি হয়। রাজসিংহ রীতি কাঞ্চির পাথর সাজিয়ে নির্মিত কয়েকটি মন্দিরে দেখা যায়। মহাবলীপুরমেও এরূপ কয়েকটি মন্দির তৈরি করা হয়। কাঞ্চির কৈলাসনাথ মন্দির হল এই রীতির প্রখ্যাত নিদর্শন। এছাড়া বৈকুণ্ঠ পেরুমল মন্দিরেরও নাম উল্লেখ্য। রাজসিংহ রীতির মন্দিরের সংখ্যা হল ছয়টি। তার মধ্যে তিনটি যথা—তীর মন্দির, ঈশ্বর মন্দির ও মুকুন্দ মন্দির আছে মামল্লপুরম বা মহাবলী পুরমে, বাকী তিনটি হল কাঞ্চির কৈলাসনাথ ও বৈকুণ্ঠ মন্দির এবং দক্ষিণ আর্কটের পনমলই মন্দির। রাজসিংহ গোষ্ঠীর মন্দিরগুলির মধ্যে মামল্লপুরমের তীর মন্দির প্রাচীনতম। একেবারে সমুদ্রের ওপরে অবস্থিত হওয়ায় একে তীর মন্দির বলা হয়। বৃহৎ প্রাচীর বেষ্টিত চতুর্ভুজাকার প্রাঙ্গণে মন্দিরটি অবস্থিত। খ্রিস্টিয় সপ্তম শতকের শেষ দিকে এটি তৈরি হয়েছিল। তীর মন্দিরটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, এর উন্নত পরিকল্পনা। এখানে পাশাপাশি দুটি মন্দির আছে। মন্দির দুটি অসামঞ্জস্যভাবে সংলগ্ন হয়ে আছে। প্রতিটি মন্দিরের একটি নিজস্ব পিরামিডাকার বিমান আছে এবং সেই বিমানটি একটি গম্বুজাকার স্তূপিক এবং কারুকার্যমণ্ডিত সূক্ষ্ম অগ্রভাগ দ্বারা সম্পূর্ণ। পূর্বদিকের সমুদ্রের মুখোমুখি মন্দিরটি আয়তনে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। দুটি মন্দিরের মধ্যে এই শিব মন্দিরটি প্রধান। পশ্চিম দিকে অবস্থিত দ্বিতীয় মন্দিরটি বিষ্ণুর, সেটি তুলনায় ছোট। শিল্প বিশেষজ্ঞদের মতে, আকারে ও পরিকল্পনায় মামল্লপুরমের তীর মন্দির চতুষ্কোণ ধর্মরাজ রথের আদলে তৈরি করা হয়েছিল বলে মনে হয়। সুউচ্চ অথচ ক্ষীণ প্রতিটি বিমান এই মন্দিরকে বিশেষভাবে ছন্দোময় এবং প্রাণবন্ত করেছে। শিল্পীর স্বাধীনতা অবশ্যই এই সৌন্দর্য সৃষ্টিতে আংশিক সহায়তা করেছে। কিন্তু তার দ্বারা এই সৌন্দর্যের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা যায় না। অধ্যাপক সরস্বতী মন্তব্য করেছেন যে, এক নূতন আকাঙ্খা এই শিল্পীদের অনুপ্রাণিত করেছিল। তাঁরা তাঁদের মনশ্চক্ষুতে এক সুসমন্বিত মন্দিরের রূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

তীর মন্দির

মামল্লপুরমের তীর মন্দিরের অল্পকাল পরেই কাঞ্চিপুরমে রাজসিংহ কর্তৃক কৈলাসনাথ মন্দির নির্মিত হয়। এই মন্দিরটিকে সুসমন্বিত রূপ কল্পনার প্রথম সার্থক দৃষ্টান্ত বলা যায়। এটি একটি শৈব মন্দির। এই প্রধান মন্দির সংলগ্ন সাতটি ছোট মন্দির সমগ্র মন্দির

Scanned with CamScanner

পরিকল্পনার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। এখানে মণ্ডপের বলিষ্ঠ স্তম্ভ এবং সিংহমূর্তিগুলি সমগ্র পরিকল্পনার সঙ্গে আশ্চর্যজনকভাবে মানিয়ে গেছে। তীর মন্দিরের বিমানের তুলনায় কাঞ্চিপুরমের কৈলাসনাথ মন্দিরের বিমান উন্নত মানের। এই মন্দিরের প্রবেশপথ দেখে মনে হয় যে, এতে গোপুরমের সূচনা হয়েছিল। এই মন্দিরের ভিতটি গ্র্যানাইট পাথরে নির্মিত হয়েছিল। দুই প্রস্থ খিলানের ওপর তৈরি এই মন্দিরের পিরামিড—প্রায় বিমান এবং তার ওপরের গম্বুজ দেখলে একে বৌদ্ধস্তূপ বলে মনে হবে। এই মন্দিরের প্রধান বৈশিষ্ট্য বহুতলযুক্ত সুউচ্চ বিসাল। কৈলাসনাথের মন্দিরে দ্রাবিড় রীতির বৈশিষ্ট্যগুলি, যেমন—প্রাচীর বেষ্টিত চত্বর, গোপুরম, স্তম্ভযুক্ত মণ্ডপ, বিমান দেখতে পাওয়া যায়। বস্তুতপক্ষে মন্দির স্থাপত্যে দ্রাবিড় রীতির বিকাশে কৈলাসনাথের মন্দির বিখ্যাত। অধ্যাপক সরস্বতী একে দ্রাবিড় স্থাপত্য শৈলীর অন্যতম প্রধান নিদর্শন বলে মনে করেন।

কৈলাসনাথ মন্দির

কাঞ্চিপুরমের বৈকুণ্ঠ পেরুমল মন্দির হল বিষ্ণুর মন্দির। কৈলাসনাথ মন্দিরের কিছুকাল পর দ্বিতীয় নরসিংহবর্মন রাজসিংহ কর্তৃক এই মন্দিরটি নির্মিত হয়। এই মন্দির গাত্রে উৎকীর্ন লেখ থেকে পল্লব যুগের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অনেক তথ্য পাওয়া যায়। এই মন্দিরের বিভিন্ন অংশ ঘনসংবন্ধ। মন্দিরে দ্রাবিড় শিল্পরীতিতে মার্জনা ও পরিশীলতার ছাপ সুস্পষ্ট। এই মন্দিরগুলিকে পল্লব স্থাপত্যের সবচেয়ে পরিণত নিদর্শন মনে করা হয়।

বৈকুণ্ঠ পেরুমল মন্দির

স্বাধীন ও স্বতন্ত্র মন্দির নির্মাণ ধারার দ্বিতীয় শ্রেণির মন্দিরগুলির নির্মাণ নন্দিবর্মন গোষ্ঠীর রাজত্বকালে (৮০০-৯০০ খ্রিস্টাব্দ) হয়। এই সময়ের মন্দিরগুলি আয়তনে ছোট। পল্লব যুগের এই পর্যায়ের মন্দিরগুলি আগের পর্যায়ের মত উজ্জ্বল নয়। এই মন্দিরগুলির মধ্যে কাঞ্চিপুরমের মুক্তেশ্বর মন্দির এবং মতঙ্গেশ্বর মন্দির উল্লেখযোগ্য। এই মন্দিরগুলির মধ্যে অমরাবতীর শিল্পকলার প্রভাব দেখা যায়।

এছাড়া পল্লব স্থাপত্যের শেষ ধাপে ছিল অপরাজিত রীতি। অপরাজিত পল্লব এই রীতির প্রবর্তন করেন। এই রীতির নিজস্ব কোন বৈশিষ্ট্য ছিল না। অপরাজিত রীতি ক্রমশ পল্লব শিল্পকে চোল শিল্পের নিকটবর্তী করেছিল। পল্লব স্থাপত্যশৈলী যেমন দক্ষিণ ভারতীয় স্থাপত্যের আদর্শ ছিল, তেমনি জাভা, কাম্বোডিয়া ও ভিয়েতনামেও প্রভাব বিস্তার করেছিল।

পল্লব ভাস্কর্য (Pallava Sculpture) ঃ দক্ষিণ ভারতে পল্লব ভাস্কর্য শিল্পের সূত্রপাত পল্লব যুগেই হয়েছিল। প্রথম মহেন্দ্রবর্মন ও তাঁর পুত্র নরসিংহবর্মনের রাজত্বকালে পল্লব ভাস্কর্যের অভাবনীয় অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। পল্লব ভাস্কর্যের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হল মহাবলীপুরম।

ড. সরস্বতীর মতে, পল্লব বেঙ্গী বা অমরাবতীর ভাস্কর্য শৈলীর প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। তবে বেঙ্গীর তীব্র ভাবাবেগ পল্লব রীতিতে ক্ষীণ ধারায় প্রবাহিত হয়। তথাপি

বেঙ্গীর দেহ সৌষ্ঠব, ভঙ্গী, সুষমা পল্লব রীতিতে স্থান পেয়েছে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে দ্রাবিড় রীতির গুরুভার নিতম্ব, সরল ঘনবুচির মত সংবন্ধ কেশদাম, স্ফুরিত ওষ্ঠধরা নারীমূর্তি দ্রাবিড় রীতির সাক্ষ্য দেয়। পল্লব ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন মহাবলীপুরমের "গঙ্গাবতরণের" রিলিফ। একদা এই রিলিফটিকে সমালোচকরা ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের কাহিনিযুক্ত বলে মনে করতেন। কিন্তু অধুনা সমালোচকরা মত পালটে বলেছেন যে, কিরাতার্জুনীয়ের পৌরাণিক কাহিনিটি এই রিলিফে খোদাই করা হয়েছে। ভাস্কর্যের এই ফলকটি ৩০ গজ লম্বা ও ২৩ ফুট উঁচু। এতে অসংখ্য মানুষ ও জীবজন্তুর মূর্তি খোদাই করা হয়েছে। পাহাড়ের গা কেটে এই রিলিফটি খোদাই করা হয়েছে। অনেকে এজন্য রিলিফটিকে পাথরের প্রাচীন চিত্র বলে অভিহিত করেন। শিল্প সমালোচকরা এটিকে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য বলে মনে করেন। মূর্তিগুলিতে মূল কাহিনির সঙ্গে সঙ্গতি এবং সংযমবোধ বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। রিলিফটি ক্রম অনুসারে এমনভাবে সাজানো যে, দেখে মনে হয় যেন মূর্তিগুলি সমতল পাহাড়ের গা থেকে অবিরাম উঠে আসছে। তবে Joy de Vivre বা বাঁচার আনন্দ মূর্তি ও তার রেখার ছত্রে ফুটে উঠেছে। মহাকাব্যের বিষয়বস্তুকে সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। জীব-জন্তুর মূর্তিগুলিতে গভীর মানবতাবোধের প্রকাশ ও শিল্প-সুষমার অভিব্যক্তি মিলিত হয়েছে। অনেকে বলেছেন যে, তাদের সম্পর্কে গভীরতর অনুভূতির প্রকাশ সমগ্র প্রাচ্য জগতের অন্য কোন ভাস্কর্যে দেখা যায় নি। পশু মূর্তিগুলির উপস্থাপনায় হাস্যরস সৃষ্টির সম্ভাবনাও শিল্পীদের দৃষ্টি এড়ায় নি। তপস্বী বিড়ালের মূর্তিটি তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। মহাবলীপুরমের এই ভাস্কর্য পট্ট ছাড়া, গুহা মন্দিরগুলির দেওয়ালে ভাস্কর্যের কাজও অত্যন্ত উন্নত মানের। কৃষ্ণ মণ্ডপে পশুপালকের রিলিফ, মহিষমর্দিনী মণ্ডপে দেবী দুর্গার সঙ্গে অসুরদের যুদ্ধ দৃশ্য, অনন্ত শয্যায় বিষ্ণুর মাথার ওপর ছত্র হিসাবে ফণাধারী শেষ নাগ, বরাহ অবতারের দৃশ্য প্রভৃতির রিলিফের ভাস্কর্য অতুলনীয়। তাছাড়া বরাহ গুহার ভাস্কর্যমণ্ডিত থামগুলির কথাও ভোলা উচিত নয়। কিন্তু মহামল্ল গুহা ভাস্কর্যের এই প্রাণশক্তি তীরের রথগুলির ভাস্কর্যে আশ্চর্যরকমভাবে অনুপস্থিত। সেখানে মূর্তিগুলিতে এই আশ্চর্য গতিময়তা নেই, আছে জড়ত্ব; প্রাণময়তার বদলে প্রাণহীন মৃত ম্লান সৌন্দর্য। পল্লব ভাস্কর্যে বেঙ্গীর প্রভাব থাকলেও এই প্রভাব ধীরে ধীরে কমে এসেছিল। পল্লব ভাস্কর্য বেঙ্গীর ইন্দ্রিয়-পরায়ণা থেকে মুক্ত। পুরুষ মূর্তিগুলি যেন নারী-মূর্তি অপেক্ষা বেশি প্রাণবন্ত। কিন্তু এই মূর্তিতে নেই অজন্তা, এলোরার রহস্যঘন অতীন্দ্রিয়তা, আলোছায়ার খেলা। পল্লব যুগে চিত্রকলারও সমাদর ছিল। প্রথম মহেন্দ্রবর্মনের রাজত্বকালে সিওনভাসল-এর জৈন মন্দিরে অপূর্ব চিত্রকলার নিদর্শন আছে। এছাড়াও প্রথম মহেন্দ্রবর্মনের আমলেরই কিছু গুহা মন্দির, যেমন—মামন্দুরে পল্লব চিত্রকলার অল্প কিছু নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় নরসিংহ বর্মন রাজসিংহ-র আমলে নির্মিত পন্মলই ও কাঞ্চিপুরমের মন্দিরগুলিতে পল্লব চিত্রকলার নিদর্শন পাওয়া যায়। পদুকোট্টাই রাজ্যে পল্লব চিত্রকলার নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়।

পল্লবদের ভাস্কর্য ঃ পল্লব চিত্রকলা

Scanned with CamScanner